ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
প্রতিষ্ঠার বিপক্ষে রাজনীতি ও তৎকালীন বঙ্গীয় সমাজ

শেখ মাসুম কামাল

প্র কা শ ন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিপক্ষে রাজনীতি
ও তৎকালীন বঙ্গীয় সমাজ
শেখ মাসুম কামাল
গ্রন্থস্বত্ব © লেখক ২০২৬
প্রচ্ছদ: মিতা মেহেদী

প্রকাশক: দ্যু প্রকাশন
তৃতীয় সংস্করণ: ফাল্গুন ১৪৩২, মার্চ ২০২৬
দ্বিতীয় সংস্করণ: কার্তিক ১৪২৬, অক্টোবর ২০১৯
প্রথম প্রকাশ: ফাল্গুন ১৪২৫, ফেব্রুয়ারি ২০১৯

Dhaka Biswabidyaloy Protishthar Bipokshe Rajniti
O Totkalin Bongiyo Samaj
by Shaikh Masum Kamal
Cover Designed by Mita Mehedi
Copyright © Author 2026
First Published: February 2019, Second Edition: October 2019
Third Edition: March 2026 by Dyu Publication

www.dyu.com.bd
ISBN: 978-984-80156-5-0
Printed & Bound in Bangladesh

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted in any form, of by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise) without the prior written permission of the author and publisher, except where permitted by law.

উৎসর্গ

অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম
অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন
অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম—
স্বকালের স্বপ্নব্রত সমাজ-স্বজন শিক্ষকদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা
উত্তাল দিনগুলিতে যাঁরা ছিলেন স্বপ্নলোকের প্রতীক

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিপক্ষে রাজনীতি ও তৎকালীন বঙ্গীয় সমাজ গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ২০১৯ সালে। একই বছর এর দ্বিতীয় সংস্করণও বের হয় এবং গ্রন্থটি ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়।

ঊনিশ ও বিশ শতকের বাংলার জনজীবন এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অবিশ্বাস্য সব ঘটনা এবং সেসবের অভিঘাত পূর্ব বাংলার মানুষের জীবনে কী ধরনের প্রভাব ফেলেছিল তার বাস্তবভিত্তিক রূপায়ন ঘটেছে এ গ্রন্থে। অনেকে বলেন এবং বিশ্বাসও করেন এই বাংলায় ঊনিশ শতকে নবজাগরণ এসেছিল। হয়তো এসেছিল। কিন্তু তার ফলে পূর্ব বাংলার মানুষের জীবনে উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। কেন ঘটেনি এবং কারাই বা এর জন্য দায়ী ছিলেন সেসব বিষয় নানাভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

ঘটনাবহুল সমগ্র ঊনিশ শতক ও বিশ শতকের প্রথম দুই দশক পূর্ব বাংলাসহ গোটা বঙ্গীয় সমাজ নানামাত্রিক সংঘাত ও সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এই সময় ব্রিটিশ কর্তৃক বাংলাকে ভাগ করা হয় এবং পূর্ববঙ্গ ও আসাম নিয়ে একটি নতুন প্রদেশ গঠন করা হয়। বাংলা-ভাগের প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে ওঠে পশ্চিমবঙ্গ এবং এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের একটি বিশেষ সম্প্রদায়। দীর্ঘদিন তারা বঙ্গভঙ্গ রদের জন্য আন্দোলন করেন। তাদের প্রবল চাপের কারণে বঙ্গভঙ্গের আদেশ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। কিন্তু ততদিনে (প্রায় ছয় বছর) পূর্ব বাংলার মানুষ পশ্চিমবঙ্গের কুলীন সমাজকে আর আস্থায় নিতে পারেনি। আবার এই সময়ের কিছু আগে থেকে পূর্ব বাংলায় মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ঘটতে থাকায় সমগ্র বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি ভিন্ন একটি ধারায় প্রবাহিত থাকে। পূর্ব বাংলার মানুষের শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনে নবাব স্যার সলিমুল্লাহ ব্রিটিশ সরকারের নিকট ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য দাবী উত্থাপন করেন। এরপর অনেক ঘটনাই ঘটে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলো বটে তবে সুদীর্ঘকাল একটি মিথ সমাজে প্রচলিত ছিল—নবাব স্যার সলিমুল্লাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয়ের অনুকূলে যে জমি প্রদান করেছিলেন, সেই জমির ওপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থ লেখার প্রয়োজনে এই বিষয়েও ব্যাপকভাবে তথ্যানুসন্ধান করি। সমুদয় তথ্য পর্যালোচনা ও অন্যান্য বাস্তব পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করার পর যে চিত্র পাওয়া গেল প্রকৃতপক্ষে তা বিস্ময়ের উদ্রেক না করে পারে না।

বর্তমান গ্রন্থখানা প্রকাশ পাবার পর দৈনিক সমকাল যে অনুসন্ধানীমূলক প্রতিবেদন প্রকাশ করে পাঠকবর্গের পাঠের সুবিধার্থে ওই প্রতিবেদন বইয়ের শেষে পরিশিষ্ট হিসেবে যুক্ত করা হলো। পূর্ব বাংলার ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিপক্ষে অনেকেই ছিলেন। সে সময় ঢাকার স্থানীয়রাও ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। তখন 'ঢাকা প্রকাশ' ছিল জনপ্রিয় পত্রিকা। ওই পত্রিকার একটি প্রতিবেদন—

> গত ১০ই ফেব্রুয়ারী, ঢাকা উকিল-সমিতির এক সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে। ঢাকায় স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় একজন বিশেষ কর্মচারীর অধীনে স্বতন্ত্র শিক্ষাবিভাগ গঠিত করার জন্য বড়লাট বাহাদুর অনুমোদন করিয়াছেন; এই সংবাদে ঢাকার উকিল-সমিতি বড়ই শঙ্কিত হইয়াছেন। প্রস্তাবিত বিষয় কার্য্যে পরিণত হইলে এদেশে শিক্ষার অবনতি হইবে ইহাই তাহারা বিশ্বাস করেন; পরন্তু প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপনের কোন আবশ্যকতা নাই।

বর্তমান সংস্করণে অনেক নতুন তথ্য যোগ করা হয়েছে। ফলে বৃদ্ধি পেয়েছে বইটির কলেবর। একজন কৃতী মানুষের নামের শেষে পদবী ভুল ছিল, বর্তমান সংস্করণে তা সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধন করা হয়েছে ভুল বানান। ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয়কে তৎকালীন সরকার কী পরিমাণ জমি প্রদান করেছিলেন তার উল্লেখ আছে।

গ্রন্থখানা প্রকাশিত হবার পর ফোন করে কেউ কেউ হুমকি প্রদান করেছিলেন। সত্য প্রকাশের খাতিরে সেসব উপেক্ষা করেছি। আশা করি গ্রন্থটি সবার কাছে সমাদৃত হবে।

শেখ মাসুম কামাল
৫ নভেম্বর ২০২৫
ফ্ল্যাট: সি-৭, ভবন-৫, স্বপ্ননগর আবাসিক এলাকা-১
মিরপুর-৯, পল্লবী, ঢাকা-১২১৬

ভূমিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯২১ সালে। আর দু'বছর পর বিশ্ববিদ্যালয়টি শতবর্ষী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইতিহাসের পাতায় স্থান পাবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বিগত যুগের রোমান্টিক কোনো কাহিনি নয়। এর সঙ্গে সরাসরি অঙ্গাঙ্গি হয়ে আছে সেকালের বঙ্গীয় সমাজের দুঃখময় সমাজচিত্র। সেই সময় বঙ্গীয় সুশীল সমাজের একটি অংশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের মধ্যদিয়ে পূর্ববঙ্গ নামে নতুন একটি প্রদেশ গঠন করা হয়। ঢাকাকে করা হয়েছিল পূর্ববঙ্গের রাজধানী। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের এই ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। সেকালে সারস্বত সমাজের বিরোধিতার কারণে সরকার বঙ্গভঙ্গ রদ করতে বাধ্য হয়। নবসৃষ্ট পূর্ববঙ্গ প্রদেশটি আর টিকল না। ঢাকা হারাল প্রদেশিক রাজধানীর মর্যাদা। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পর পূর্ববঙ্গের সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে অবহেলিত মুসলমান সমাজের জন্য ব্রিটিশ সরকার শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল, তার ফলশ্রুতিতে খুব দ্রুত পূর্ববঙ্গের অবহেলিত ও পশ্চাদপদ মুসলমান সমাজভুক্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের বিশেষ সুযোগ সৃষ্টি হয়। বঙ্গভঙ্গ রদের আন্দোলনের ফলে ১৯১১ সালে পূর্ববঙ্গ নামে নতুন প্রদেশ বিলুপ্ত হলেও পূর্ববঙ্গের মানুষের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ আদৌ যেন বন্ধ না হয়, সেজন্য ক্ষতিপূরণ হিসেবে পূর্ববঙ্গের মানুষের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে নবাব স্যার সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে পূর্ববঙ্গের মুসলিম নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ সরকারের নিকট পূর্ববঙ্গে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আবেদন জানান। এই আবেদনের প্রেক্ষিতেই সরকার পূর্ববঙ্গে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিল। সরকারের এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে বিশেষ মহল অপতৎপরতা শুরু করে এবং ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ড. রাসবিহারী ঘোষের নেতৃত্বে একটি দল ১৯১২

সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি লর্ড হার্ডিঞ্জের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁরা তাঁদের ক্ষোভের কথা জানান। তাঁরা বলেছিলেন, পূর্ববঙ্গ কৃষিপ্রধান দেশ। এখানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে কোনো লাভ হবে না। কারণ, ড. রাসবিহারীদের মতো মানুষের নিকট পূর্ববঙ্গের মানুষ কৃষকসমাজ হিসেবেই চিহ্নিত ছিল। এম এ রহিম লিখেছেন—

> The Hindu leaders were opposed to the plan of setting up a University at Dacca. They voiced their disapprobation in press and platform. On February 16, 1912 a delegation headed by Dr. Ras Behary Ghosh waited upon the Viceroy and expressed apprehension that the creation of a separate University at Dacca would be in the nature of 'an internal patition of Bengal'. They also contended that "the Muslims of Eastern Bengal were in large majority cultivators and they would benefit in no way by the foundation of a University".

তারপর বঙ্গীয় সমাজে অনেক ঘটনাই ঘটেছিল এবং তার প্রায় সবই ছিল খুবই অনভিপ্রেত এবং অপ্রত্যাশিত। পূর্ববঙ্গের মানুষের প্রতি যে অবহেলার নজির স্থাপন করেছিলেন সেকালের বাংলার একটি অংশের বুদ্ধিজীবী সমাজ, সেসব কাহিনি পড়লে বিস্ময় না জেগে পারে না! তারা বলতেন, পূর্ববঙ্গের মানুষের মধ্যে একটি বড় অংশ হলো চাষি সম্প্রদায়—'The Muslims of Eastern Bengal were in large majority cultivators and they would benefit in no way by the foundation of a University.' তাই মুসলমানদের জন্য এখানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে কোনো লাভ নেই।

ওই সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে এগিয়ে আসেন নবাব স্যার সলিমুল্লাহ। ওই আন্দোলনের সঙ্গে নবাব নওয়াব আলী চৌধুরীসহ আরও অনেকেই সম্পৃক্ত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে এ কে ফজলুল হকও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ১৯১৩ সালের ৪ এপ্রিল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে ইংরেজিতে তিনি যে বক্তব্য প্রদান করেছিলেন তার কিছু অংশের বঙ্গানুবাদ—

> আমি পূর্ব বাংলার শিক্ষার ক্ষেত্রে অনগ্রসরতার কারণ দূরীকরণের প্রয়াস বা মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলের কেন্দ্রে একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অপরিসীম গুরুত্বের বিষয়টি ছোট করে দেখতে চাই না। কিন্তু আমি এই তত্ত্বের প্রতিবাদ করি যে এই বিশ্ববিদ্যালয় কেবলমাত্র মুসলমানদের খুশি করার জন্য করা হচ্ছে। ভাইসরয় স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সমান সুযোগ সুবিধার জন্য স্থাপন করা হচ্ছে।

বর্তমান গ্রন্থে সেকালের বঙ্গীয় সমাজের তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাবলি বিধৃত করা হয়েছে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সামাজিক ও মানসিক ক্ষেত্রে যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছিল, স্বল্পকথায় তার ঐতিহাসিক বিবর্তনের রেখাচিত্র অঙ্কনের চেষ্টা করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিপক্ষ-সমাজের মনোজগতের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যেসব তথ্য বর্তমান গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে, সেসব আদৌ কাল্পনিক নয়। বক্তব্যের সপক্ষে যত দূর সম্ভব তথ্যপ্রমাণ যুক্ত করা হয়েছে। ইতিহাসের যাত্রাপথের সব গান বিশেষ কোনো ধারায় রচিত হয় না। অতীত প্রেক্ষিত অজানা থাকলে ইতিহাসের মূলধারা অনুসন্ধান করাও যায় না। সামাজিক ইতিহাসের প্রতিটি ঘটনার রেখা টানতে হলে তার বিশ্লেষণও প্রয়োজন। অন্যথায় পাঠকের কাছে ইতিহাসের ঘটনাবলি একটি গল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবে। ইতিহাস গল্প নয়। অন্য অর্থে ইতিহাস ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরার একটি নিখাদ আলেখ্য। জনজীবনের বিভিন্ন কাহিনি পাঠ করার পর পাঠকের মনে যে কম্পন সৃষ্টি হয়, তার তরঙ্গ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়, ইতিহাসের মূল দর্শন তার ভেতরে যদি সঞ্চার করা সম্ভব হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টির পর পূর্ববঙ্গের সমাজ ও সংস্কৃতির অভ্যন্তরে যে নবতরঙ্গের সৃষ্টি হয়েছিল, তার ফসল হলো বাংলাদেশ কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী সমাজ। আরও গভীরে প্রবেশ করলে বলতেই হয়, বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের অভিযাত্রার সড়কটি প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ, ১৯৭১-এর মুক্তি সংগ্রামে জীবনদান করে।

গ্রন্থটি লেখার সময় আমার স্ত্রী শাপলা শিরিন (অধ্যাপক, গণিত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার থেকে একাধিক দুর্লভ বই সংগ্রহ করে দিয়েছেন। আমার কন্যা ফারহানা তাবাস্‌সুম প্রিয়ম প্রয়োজনীয় তথ্য নিজ হাতে কপি করে দেয়ায় তথ্য সংযুক্তির ক্ষেত্রে আমার শ্রম অনেকটাই লাঘব হয়েছে। কাজী মুহম্মদ আরিফ গ্রন্থটি লেখার সময় ব্যক্তিগত উদ্যোগে মূল্যবান কিছু গ্রন্থ সংগ্রহ করে দিয়ে আমায় ঋণী করেছেন। ঢাকা কলেজের দর্শন বিভাগের ছাত্র স্নেহভাজন মোর্শেদ হালিম পাণ্ডুলিপি পরিমার্জনের সময় সময় দিয়ে আমায় আমার শ্রম লাঘব করতে যথেষ্ট অবদান রেখেছে। অনেক লেখকের গ্রন্থ থেকে রসদ সংগ্রহ করে বর্তমান গ্রন্থে ব্যবহার করেছি—তাঁদের সবার প্রতি আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জ্ঞাপন করছি।

এই গ্রন্থে অর্ন্তভুক্ত বিষয়ের কালপরিধি ১৯০৫ সাল থেকে শুরু করে ১৯২১ সালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ১৯০৫ সালে সংঘটিত হয়েছিল বঙ্গভঙ্গ

আন্দোলন এবং ১৯২১ সালে শুরু হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক যাত্রা। ১৯০৫ সাল থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত সংঘটিত উল্লেখযোগ্য প্রায় সব ঘটনা স্বল্প কথায় গ্রন্থভুক্ত করা হয়েছে। ১৯২১ সালের পরবর্তী কোনো ঘটনা গ্রন্থভুক্ত না করার পক্ষে যুক্তি এই যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টির পরবর্তী যুগের ইতিহাস অল্পবিস্তর অনেকেই জানেন। ১৯০৫ সাল থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত তৎকালীন বঙ্গীয় সমাজের অনেক তথ্য বর্তমানে স্মৃতি-বিস্মৃতির অন্তরালে চলে গেছে। যে কারণে এই অংশটির ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল প্রসঙ্গে আলোচনার সময় ১৯২৬-২৮ সাল পর্যন্ত কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ওটুকু করা হয়েছে প্রয়োজনের তাগিদেই। গ্রন্থটির ওপর পাঠকদের তরফ থেকে সুচিন্তিত অভিমত প্রত্যাশা করছি। দ্যু প্রকাশন গ্রন্থটি প্রকাশের মধ্যদিয়ে আমায় কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

শেখ মাসুম কামাল
১৪ ডিসেম্বর ২০১৮
ফ্ল্যাট: বি/৫, শহিদ এ এন এম মুনিরুজ্জামান ভবন
ফুলার রোড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকা
priom_masum@yahoo.com

বিষয়সূচি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিপক্ষে রাজনীতি : প্রসঙ্গ কথা ১৫
প্রাসঙ্গিক পর্যালোচনা ৫০
পূর্ববঙ্গে মুসলমানদের ধর্মীয় আন্দোলনের স্বরূপ ৫৮
পূর্ববঙ্গের মানুষের দুর্গতির স্বরূপ ৬১

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সূচনাপর্ব ৭৯
বঙ্গবঙ্গ : যুক্তি-তক্কো-গল্প ৮১
যে কথা যায় না বলা ৮৪
বঙ্গভঙ্গ : নতুন প্রদেশ : লাভ-ক্ষতির হিসাব ৮৫

ভারতে ইসলামি আন্দোলন ও পূর্ববঙ্গের মুসলমান সমাজ ৯৫
ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনে মুসলমান নেতৃবৃন্দের
দৃষ্টিভঙ্গি ও তার ফলাফল ১০৩
ওহাবি আন্দোলন ও পূর্ববঙ্গীয় সমাজ ১০৫
ফরায়েজি আন্দোলন ও পূর্ববঙ্গীয় সমাজ ১০৯
ক্ষত-বিক্ষত, বিক্ষুব্ধ মুসলমান সমাজ ১১২
কংগ্রেস গঠনের পটভূমি ১১৫
মুসলিম লীগ গঠনের পক্ষে যুক্তি ১২১
শিক্ষা ও চাকরি ক্ষেত্রে বৈষম্য: মুসলমানদের ক্ষোভ ১২৪
তার পরের কথা ১৩১
যে কারণে বঙ্গভঙ্গের প্রয়োজন হয়েছিল ১৪০
যে কথা বলা দরকার ১৪২
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন: বিমলানন্দ শাসমলের ব্যাখ্যা ১৪৩
তৎকালীন বঙ্গীয় মুসলমান: জীবন ও সমাজ ১৪৭

বঙ্গভঙ্গ রদের আন্দোলন ও তার ফলাফল ১৫৩
বঙ্গভঙ্গ রদ : ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া ১৬০
বঙ্গভঙ্গ রদ ও বঙ্গীয় কুলীন মানস ১৬৪
বঙ্গভঙ্গ রদ : মুসলিম সমাজের প্রতিক্রিয়া ১৭৮

পূর্ববঙ্গে মুসলমানদের জন্য উচ্চশিক্ষা ২০০
কাছের মানুষ : দূরের মানুষ ২০৭
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা : উচ্চবর্গীয় হিন্দু-সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি ২১২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : সেকালের কলকাতা বুদ্ধিজীবীদের মন ২১৬
বঙ্গভঙ্গ : বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ : লাভ-ক্ষতি ২১৯
বঙ্গভঙ্গ রদ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২২৩
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত চাঞ্চল্যকর তথ্য ২২৩
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : প্রতিষ্ঠালগ্নের কাহিনির বিস্তার ২২৮
পেছনের কিছু ঘটনা : ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ ২৩৩
সীমার মাঝে অসীম ২৩৩
বেদনার কাব্য ২৩৮
বন্ধন থেকে মুক্তি ২৪২

স্বপ্নের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : বিবিধ প্রসঙ্গ ২৪৭
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্প : নাথান কমিটি ২৪৭
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বাজেট বরাদ্দ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ ২৪৯
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন কর্তৃক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ ২৫১
স্যাডলার কমিশনের রিপোর্ট :
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে কোনো বাধা নেই ২৫২
বিশ্ববিদ্যালয়ের ধরন ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিতর্ক : পক্ষে-বিপক্ষে ২৫২
যেসব সুপারিশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য চূড়ান্ত করা হয়েছিল ২৫৪
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা : আরও দুটি কথা ২৫৮
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : বিরোধিতার শেষ অধ্যায় ও সুখের কথা ২৬১

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : পূর্ববঙ্গে শিক্ষা-ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত ২৬৩
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্নের শিক্ষকবৃন্দ ২৬৬

শেষ কথা ২৬৮

পরিশিষ্ট ২৭৫
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল সমাচার ২৭৫
সংক্ষিপ্ত তথ্যকণিকা ২৮১
ঢাবির ভূসম্পত্তির কিনারা হলো না শতবর্ষেও ২৮৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিপক্ষে রাজনীতি প্রসঙ্গ-কথা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ইতিহাস অনেক কারণে গুরুত্বপূর্ণ। ওই সময় উচ্চবর্গীয় হিন্দু সমাজের অসহযোগিতার কারণে পূর্ববঙ্গের ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিষয় রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত হয়েছিল। এই বিরোধের সূত্রপাত ঘটেছিল ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে আবর্তন করে। পূর্ববঙ্গের ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবিটি পূর্ববঙ্গীয় মুসলমান সমাজের নেতৃবৃন্দের তরফ থেকে ব্রিটিশ শাসকদের নিকট উত্থাপনের পর বঙ্গীয় সমাজে ভঙ্গুরমনস্ক ভাবের উদয় হয়। তারপর পশ্চিমবঙ্গের উচ্চবর্গীয় হিন্দু সমাজ ও পূর্ববঙ্গীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের মধ্যে বড় ধরনের দূরত্ব তৈরি হওয়ায় সমাজে অনেক রকম জটিলতা বিচিত্র ধারায় আত্মপ্রকাশ করেছিল। তারই ফলশ্রুতিতে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধন শিথিল হতে থাকে। ১৭৫৭ সালে পলাশি যুদ্ধের পর সংক্ষুব্ধ হওয়ার মতো অনেক ঘটনা বঙ্গীয় সমাজে ঘটেছে এবং তার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সমগ্র বঙ্গীয় সমাজ। একথা সত্য, যখন বিশেষ কোনো বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় তখন তার পেছনে দৃশ্যমান কোনো কারণ থাকে। সুতরাং কোনো কারণ ছাড়াই এসব কথা বলা হচ্ছে না। বিগত দুশো বছরের বঙ্গীয় রাজনীতির ইতিহাস পর্যালোচনা করা হলে দেখা যাবে যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অভাবটাই তখন থেকেই প্রবল হয়ে উঠেছিল, যখন এ দেশের শাসন ক্ষমতা চলে যায় বণিক জাতির হাতে। বিষয়টি আরও তাৎপর্যপূর্ণ করতে কিছু কথা এখানে উল্লেখ করা দরকার। ভারতে মুসলমানদের অধিকারপর্বে অপ্রীতিকর ঘটনা যে ঘটেনি সেকথা অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু মুসলমানদের আগমনের অব্যবহিত পরে ভারতীয় ও বঙ্গীয় সমাজে হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মাত্রা ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে

থাকে। ভারত ও বাংলাদেশের ইতিহাসবিদরা সেকথা তাঁদের লেখায় প্রমাণ করে দেখিয়েছেন এবং বলেছেন মুসলমানদের শাসন আমলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অনুদার ছিল না ও সামাজিক প্রয়োজনে হিন্দু সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠানে মুসলমানরা অংশগ্রহণ করতেন। সুলতানি ও মুঘল যুগের ইতিহাসে এর অনেক প্রমাণ রয়েছে। এই বিষয়ে একটি তথ্য উল্লেখ করা যেতে পারে—

> বোধিগয়ার মহাবোধি মন্দির চর্তুদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সুলতানদের রাজত্বকালে পুনর্নির্মাণ করা হয়। মুহম্মদ বিন তুঘলক যখন দুর্ভিক্ষের সময়ে দিল্লি থেকে রাজধানী স্থানান্তরিত করে নতুন জায়গায় নিয়ে যান, তখন সেখানকার নামকরণ করেন সংস্কৃত ভাষায় 'স্বর্গ-দুয়ারি'। তিনি 'হোলি' খেলতেন ও 'যোগী'দের সঙ্গে আলোচনায় বসতেন। তিনি জৈনদের জন্য উৎকণ্ঠা ব্যক্ত করেন, তিনি দুজন জৈন নেতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন।... অনিলচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় লেখেন, 'শ্রেষ্ঠ মুঘল সম্রাটগণ ভারতে এমন এক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন যাহা এই বিশাল উপ-মহাদেশ অশোকের সময়ের পর আর উপলব্ধি করে নাই।'[১]

মুসলমান শাসকরা হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করতেন। রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তা বন্ধ করেছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষ্য হলো তার আগে মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব সতীদাহ বন্ধ করেছিলেন। মুসলমান শাসকদের যুগে রাজকীয় উঁচু পদে হিন্দুদের অংশগ্রহণ ছিল। ব্রিটিশদের আগমনের আগেই ভারতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ক্ষেত্রটি বিকশিত হয়। এ ক্ষেত্রে মুসলমান সুফীদেরও রয়েছে বিশেষ ভূমিকা। তাঁদের উদার দৃষ্টিভঙ্গী বিভিন্ন ধর্মের আধ্যাত্মিক-নৈতিক সম্পর্ক সম্বন্ধে গভীর আগ্রহের সৃষ্টি হলো ও তাদের উদারনৈতিক মানবিক গুণগুলো বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের পরস্পরের নিকট করে তুলল।

আহমদ রফিক বলেন—

> ভারতীয় উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতা রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক তাৎপর্য নিয়ে বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে প্রধানত ইংরেজ শাসনামলে, তাদের সাম্রাজ্য স্বার্থ রক্ষার প্রয়োজনে। কথাটা ইতিহাসবিদ বিপান চন্দ্রও বলেছেন। তাঁর মতে, মধ্যযুগীয় রাজনীতি সাম্প্রদায়িক ছিল না। ভারতে সাম্প্রদায়িকতার প্রকাশ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রভাবে এবং বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণি ও গোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়ায়। সেই সূত্রে আধুনিক রাজনীতির হাত ধরে সাম্প্রদায়িকতাবাদের উত্থান।[২]

---

১. অমলেন্দু দে, *ধর্মীয় মৌলবাদ ও ধর্ম-নিরপেক্ষতা*। প্রতিভাস, কলকাতা-২০১৪, পৃ. ৪০

২. *সাম্প্রদায়িকতা ও সম্প্রীতির ভাবনা*, আহমদ রফিক সম্পাদিত, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ৯।

ব্রিটিশ যুগের আগে সমাজে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিমণ্ডল যেভাবে গড়ে উঠেছিল, ব্রিটিশ রাজশক্তির অপ্রতিহত গতি এবং বঙ্গীয় সমাজভুক্ত এক শ্রেণির মানুষের মনে ব্রিটিশরাজের আজ্ঞাবহ হওয়ার প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি হওয়ায় সামাজিক সংকট নতুন রূপ পেল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোট বা চাপকান প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন—

> দীন ভারতবর্ষ যেদিন ইংলণ্ডের ছিন্নবস্ত্র ভূষিত হইয়া দাঁড়াইবে, তখন তাহার দৈন্য কী বীভৎস বিজাতীয় মূর্তিধারণ করিবে। আজ যাহা কেবলমাত্র শোকাবহ আছে সেদিন তাহা কি নিষ্ঠুর হাস্যজনক হইয়া উঠিবে।

পূর্ববঙ্গের অবহেলিত মানুষের জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি সমর্থন করতে পারেননি একটি মহল, আর তাঁরাই পূর্ববঙ্গে জমিদার হওয়ার বদৌলতে এবং পূর্ববঙ্গের মানুষের শ্রম ও ঘামের বিনিময়ে কলকাতায় বাবুগিরি, সওদাগরি কারবার থেকে শুরু করে বঙ্গীয় সংস্কৃতিকে কোট-পাতলুনের ছিদ্রপথে 'নীলাম্বুরাশির মধ্যে বিলীন করিয়া নারায়ণের অনন্তশয়নের অংশ লাভ করেন'। শেষ বাক্যটি লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ওটা ধার করে এখানে জুড়ে দেয়া হয়েছে বোধের জগতে প্রবেশ করতে।

মুঘল আমলের জমিদার শ্রেণির যে বৈশিষ্ট্য ছিল তার সঙ্গে ব্রিটিশ শাসনামলের সৃষ্ট জমিদার শ্রেণির মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য ছিল। ব্রিটিশ শাসক কর্তৃক প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে সৃষ্ট নতুন জমিদারি ব্যবস্থা হিন্দু জমিদারদের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের মুসলমান প্রজাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করতে যথেষ্ট অবদান রেখেছিল। বাংলার ভূমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এই আমূল পরিবর্তনের কারণে পুরোনো হিন্দু ও মুসলমান জমিদাররা অনেকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। নতুন ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের ফলে দীর্ঘদিন যারা পুরোনো জমিদারদের অধীনে, অথবা ব্রিটিশ বণিকদের ইজারাদার বা দেওয়ান ও মুৎসুদ্দি হিসেবে কর্মরত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই নতুন ভূ-অভিজাত সম্প্রদায় হিসেবে সমাজে আত্মপ্রকাশ করেন। মুঘল যুগের অন্তিমলগ্নে বাংলায় আগত বিদেশি বণিক-জাতির কৃপাপুষ্ট এক শ্রেণির নব্য অভিজাত ব্যক্তিবর্গের উদ্ভব হয়। তারা বাঈনাচ, দুর্গোৎসব, ব্যয়বহুল বিলাসী জীবনের ধারক হয়ে—অশালীন ও বিকৃত রুচি ও সংস্কৃতির উদ্ভাবক হয়ে ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। সহজ উপায়ে অর্জিত অর্থের দাপটে বিলাসব্যসনে মত্ত হয়ে নিজেরা পঙ্কে ডুবেছেন, অন্যদেরও সেই পথের পথিক করে সমাজকেই ডুবিয়েছেন। বিনয় ঘোষ ওই সম্প্রদায় সম্পর্কে যে কথা লিখেছেন তা হলো, মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হয়ে সমাজে

তারা আবির্ভূত হয়েছিলেন। কবিগান, আখড়াই গান, পোষা বাঁদরের বিয়ে, দেবালয় নির্মাণ, গঙ্গার ঘাট নির্মাণ—এসব কাজে বাংলার নব্য ধনিক-বণিক শ্রেণি অজস্র অর্থ ব্যয় করেছেন।[৩] তিনি উল্লেখ করেছেন এ দেশের Comprador শ্রেণি ব্রিটিশ শাসকদের জুনিয়র অংশীদার হয়ে বিভিন্ন কৌশলে আঠারো শতক থেকে উনিশ শতকের প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন এবং তা সঞ্চয়ও করেছিলেন এই জন্য যে ব্যক্তিগত ব্যাপারে সেই টাকা নিয়োগ করার বিশেষ উপায় ছিল না। কর্নওয়ালিশ সেইজন্য প্রায় নিশ্চিত ছিলেন যে চিরস্থায়ী ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে নতুন জমিদারিতে এই পুঁজি নিয়োগ করার সুযোগ হবে। এই সমস্ত ব্যক্তিগত বিলাস ও মর্জি চরিতার্থের জন্য অজস্র অর্থব্যয় ছাড়াও কেবল যৌথসম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারার জন্য মামলাতে পুরুষানুক্রমে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেছেন তার কোনো হিসাব নেই এবং আজ পর্যন্ত কেউ তার একটা আনুমানিক হিসাব করার চেষ্টা করেননি। এই নতুন বিত্তবানদের আচার-আচরণ, বেশভূষায় বনেদি জমিদার শ্রেণি থেকে স্বতন্ত্র একটি গোষ্ঠী হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। উত্তরকালে তাদের অনেকেই সমাজে প্রজা-উৎপীড়ক শ্রেণি হিসেবেই আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। তাঁদের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা উপস্থাপন করা যেতে পারে।

মতিলাল শীল (১৭৯২-১৮৫৪) বাল্যকালে পিতৃহীন হন। তাঁর পিতার ক্ষুদ্র দোকান ছিল। ইংরেজদের ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ গড়ার সময় তিনি প্রয়োজনীয় পণ্য সরাবরাহ করে সামান্য যে সম্পদ অর্জন করেছিলেন, ওই অর্থ বোতল ও কর্কের ব্যবসায় বিনিয়োগ করে তিনি প্রচুর অর্থবিত্তের মালিক হয়েছিলেন। পরে তিনি ১৮২০ সালে জনৈক ব্রিটিশ ব্যবসায়ীর বেনিয়ান নিযুক্ত হন। তারপর কলকাতায় যেসব ব্রিটিশ পণ্যবাহী জাহাজ প্রবেশ করত, সেসব জাহাজ থেকে পণ্য খালাস করে বিপণন করতেন। এর মধ্যদিয়ে তিনি প্রচুর সম্পদের অধিকারী হন। তারপর তিনি বারো থেকে তেরোটি জাহাজ কেনেন এবং সেই সঙ্গে একাধিক বিদেশি কোম্পানির অংশীদার হয়েছিলেন। এ দেশ থেকে তিনি অস্ট্রেলিয়ায় বিস্কুট রপ্তানি করতেন। এছাড়া জমি কেনা-বেচার কারবারি হয়ে যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করেন।

বিশ্বম্ভর সেন মাত্র আট থেকে দশ টাকা সম্বল করে ব্যবসা শুরু করেছিলেন। তিনি কমপক্ষে কুড়িটি বাণিজ্যিক কুঠির বেনিয়ান হন এবং

৩. বিনয় ঘোষ, *বাংলার নবজাগৃতি*, কলকাতা, ১৯৭৯, পৃ: ১৪৬।

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত নগদ দুই লক্ষ টাকা গচ্ছিত ছিল তাঁর কাছে। রামদুলাল দে ছিলেন সামান্য পাঠশালার শিক্ষকের পুত্র। রামদুলাল দে'র মাতামহ মদন মিত্রের বাড়িতে সাধারণ একজন গৃহকর্মী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। মদন মিত্র রামদুলাল দে'কে আমদানি-রপ্তানির কাজ শেখাতে পর্যায়ক্রমে 'বিল সরকার' এবং 'শিপ সরকার' পদে নিয়োগ দিয়েছিলেন। এই পদে কর্মরত থাকার সময় তিনি একটি জলমগ্ন জাহাজ নিলামে খরিদ করেন এবং এর মাধ্যমে প্রায় লক্ষাধিক টাকা আয় করেন। তিনিও কমপক্ষে চারটি জাহাজ খরিদ করেন। ওই যুগে বাঙালিদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সম্ভবত বড় ধনী। ঠাকুর পরিবারের আদিপুরুষ দর্পনারায়ণ ঠাকুর হুইলারের অধীনে দেওয়ানি কাজ করে প্রচুর বিত্তের অধিকারী হয়েছিলেন। তদীয় পুত্র দ্বারকানাথ ঠাকুর লবণ ব্যবসায়ী প্লাইডেনের দেওয়ানি করে প্রচুর বিত্তের মালিক হয়েছিলেন। এরপর কুষ্টিয়ার কুমারখালিতে রেশমের কুঠি ক্রয় করেন। তারপর রেশমের ব্যবসা শুরু করেন। একজন বিচক্ষণ মানুষ ছিলেন। এক সময় ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের প্রধান কর্মকর্তা পদেও নিয়োগ পান। তারপর নীলের ব্যবসা শুরু করেন। শোভা বাজারের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা নবকৃষ্ণ ছিলেন লর্ড ক্লাইভের দেওয়ান। নসীপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দেবী সিংহ পলাশির যুদ্ধে লর্ড ক্লাইভকে সহযোগিতা করেন এবং পুরষ্কারস্বরূপ কোম্পানির দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন। কলকাতার খিদিরপুরের গোকুল ঘোষাল গভর্নর ভেরলেস্টের দেওয়ান ছিলেন। কাশিম বাজার রাজবংশের শিরোমনি কৃষ্ণকান্ত নন্দী হেস্টিংসের বেনিয়ান ছিলেন। তিনি ব্রিটিশ কোম্পানির সহযোগিতায় রানি ভবানীর জমিদারির অংশ হাসিল করেন। কালী প্রসন্ন সিংহের পূর্বপুরুষ শান্তিরাম সিংহ পাটনার চিফ মিডলটন ও স্যার টমাস রামফেল্ডের দেওয়ান ছিলেন।

এবার গোবিন্দরাম মিত্রের প্রসঙ্গ। ১৬৮৬-১৬৮৭ সালে ব্যারাকপুর ও চনকের নিকটবর্তী গ্রাম থেকে উঠে এসে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কাছে বসবাস শুরু করেন। ফারসি জানতেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর জব চার্নকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হন। সামান্য ইংরেজি জানার সুবাদে কোম্পানির অধীনে একটা চাকরি জুটিয়ে নেন। পলাশী যুদ্ধের পর গোবিন্দরাম ডেপুটি ফৌজদার পদ লাভ করেন। হলওয়েল গোবিন্দরামকে 'কালা ডেপুটি' বলতেন। অচিরেই তিনি কুখ্যাতি অর্জন করেন কুকর্মের জন্য। কোম্পানির অর্থ আত্মসাৎ করেন। কোম্পানি পুরোনো কাগজপত্র দেখাতে বললে গোবিন্দরাম জানান পুরোনো কাগজপত্র নেই, ঝড়ে উড়ে

গেছে। আনেক কাগজ উইপোকার পেটে চলে গেছে। তিনি জালিয়াতি করে কোম্পানির দেড় লাখ টাকার সম্পত্তি আত্মসাৎ করেন। ধর্মপ্রাণ গোবিন্দরাম মিত্র চিৎপুরে বড়-সড় নয়টি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

শ্যামবাজারের কৃষ্টরাম বসুর পিতা দয়ারাম ছিলেন খুব গরীব। তাঁর পুত্র কৃষ্টরাম কলকাতায় আগমন করেন। সামান্য বিদ্যাশিক্ষার বদৌলতে হিসাব-পত্তর লেখার কাজ করার অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। সামান্য অর্থ সংগ্রহ করে জনসাধারণের জন্য সংগৃহীত লবণ গুদামজাত করেন। এক দফায় লাভ হয় চল্লিশ হাজার টাকা। এরপর ফটকা কারবারে জড়িয়ে পড়েন। অল্পদিনের মধ্যে বিপুল বিত্তের অধিকারী হন। কোম্পানির অধীনে চাকরি খুঁজছিলেন। সেটাও পেয়ে যান। ২০০০ টাকা বেতনে হুগলীর দেওয়ান পদ। তাকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি, তখনকার দিনের কলকাতার অন্যতম কোটিপতি হিসেবে পরিগণিত হন। যশোর, হুগলী, বীরভূমে জমিদারি খরিদ করেন।

নরহরি কবিরাজ লিখেছেন, ইংরেজ শাসনকালের সূচনা থেকেই প্রধান প্রধান হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত পরিবারের লোকেরাই ইংরেজ শাসকের অধীনে চাকরি পাবার নিমিত্ত উন্মুখ হয়ে থাকতেন।[৪] এই পথ সহজ হয়ে যায় মুসলমানদের বিপক্ষে ইংরেজ শাসকবর্গের তরফ থেকে হিন্দুদের উৎসাহ প্রদানের পরিপ্রেক্ষিতে। কেমন করে ইংরেজ শাসনামলে তথাকথিত বঙ্গীয় হিন্দু সম্প্রদায় এই সুযোগ লাভ করেছিল, সেসব কথা এখানে আলোচনা করা খুব জরুরি নয়। কিন্তু কথা প্রসঙ্গে তো সেসব কথা অল্পস্বল্প চলে আসবেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি পূর্ববঙ্গীয় সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হলেও এর বিপরীতে বঙ্গীয় সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে প্রতিবাদি হওয়ায় সমাজ উত্তাল হয়ে ওঠে। আপাতত তার একটা সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা প্রদান করা দরকার। ভারতে মুসলমান শাসকদের আবির্ভাবের পর বঙ্গীয় সমাজে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বল্প মাত্রায় দ্বন্দ্ব ও বিরোধ বিদ্যমান ছিল। এরপরও উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিও ছিল। মুসলমান শাসকরা অনেক ক্ষেত্রে উদারতা প্রদর্শন করায় সেকালের সামাজিক অবস্থা ও ব্যবস্থা ভঙ্গুর অবস্থায় পতিত হয়নি। সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনকালে ভারতে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের মধ্যে বিশেষ পরিবর্তন ঘটে। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর

৪. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, *আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক*, ঢাকা, ২০০৪, পৃ: ৭।

মুঘল সাম্রাজ্য ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ে। এই সময় ব্রিটিশ বণিক জাতি বাংলার রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। তৎকালীন হিন্দু সম্প্রদায় ব্রিটিশের অনুগ্রহপুষ্ট হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে। ব্রিটিশ যুগের পূর্বে সমাজে যে সংহতি ছিল তার কারণ হলো মুসলমান শাসকদের আমলে হিন্দুরা যথেষ্ট ভালো অবস্থানে ছিল।

ইরফান হাবিব উল্লেখ করেছেন—

> ...হিন্দুরা উদ্বৃত্ত সম্পদ তৈরি করত এবং মুসলিমরা তা ভোগ করত এ কথার অযৌক্তিকতা অত্যন্ত স্পষ্ট ধরা পড়বে যদি মোগলদের সময়ের জমিদার শ্রেণির স্থানীয়ভিত্তিক সার্ভে আইন-ই-আকবরিতে (১৫৯৫) তাঁদের নামধাম পড়ে দেখা হয়। বেশিরভাগ জমিদারই ছিলেন হিন্দু উচ্চবর্ণের লোক। এমনকী যেসব এলাকায় বেশিরভাগ কৃষক মুসলিম ছিল (যেমন—বাংলায়) সেখানেও বেশিরভাগ জমিদার ছিলেন কায়স্থ।[৫]

বাংলায় স্বাধীন নবাবী আমলে ও বাংলার জমিদারের মধ্যে অধিক সংখ্যক ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। অনিরুদ্ধ রায় উল্লেখ করেছেন মুর্শিদকুলি খাঁ বাংলায় বিপুলসংখ্যক হিন্দু জমিদার সৃষ্টি করেন। এর আগে এত বিপুল সংখ্যক জমিদার ও পদস্থ কর্মচারি কোনো মুসলমান শাসকের আমলে ছিল না।[৬]

ধারণা করা হয়েছিল যে বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন সময় হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যে দূরত্ব তৈরি হয়েছিল, ভারত ভাগের মাধ্যমে ভৌগোলিক মানচিত্রের পরিবর্তন ঘটলে নিশ্চয় তার অবসান হবে। পারতপক্ষে তা হয়নি। ব্রিটিশ শাসনযুগের শেষ শতকে হিন্দু এবং মুসলমান—উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদ-বিভেদের মাত্রা অনেক বৃদ্ধি পেল। রাজনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রেও তার প্রভাব বিপুলভাবে আঘাত হেনেছিল। এই বিষয়টি খুব তীব্রভাবে অনুভব করা সম্ভব হলো বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন এবং তার ফলাফলস্বরূপ বঙ্গীয় সমাজে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনা মুসলিম-মানসকে প্রভাবিত করেছিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সূত্রপাত কেন হয়েছিল তার পক্ষে এবং বিপক্ষে অনেকে অনেক কথাই লিখেছেন। তবে একটি কথা এক বাক্যে সবাই স্বীকার করেন যে বঙ্গভঙ্গ রদের আন্দোলন

---

৫. মইনুল হাসান, *মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, ইতিহাস রচনা এবং এই সময়*, রূপালী পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ১৩৯।

৬. অনিরুদ্ধ রায়, *মুঘল সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৭৯, ৭৮৯, ৭৯৯।